তাওহীদ পন্থীদের নয়নমণি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১ম অধ্যায় - তাওহীদের ফযীলত এবং তাওহীদ যে সমস্ত গুনাহ্ মিটিয়ে দেয় (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ আব্দুর রাহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ)

তাওহীদের ফযীলত এবং তাওহীদ যে সমস্ত গুনাহ্ মিটিয়ে দেয় - ১

ব্যাখ্যাঃ باب তথা অধ্যায় অর্থ হচ্ছে কোনো বিষয়ে বা স্থানে প্রবেশ করার রাস্তা। লেখক বলেনঃ وما يكفره من الذنوب এখানে ما শব্দটি মাসদারীয়া তথা ক্রিয়ামূলের অর্থ প্রদান করেছে। অর্থাৎ তাওহীদ কর্তৃক গুনাহসমূহ মোচন করা সম্পর্কে। ما শব্দটি মাউসূলার অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন অর্থ হবে والذي يكفره من الذنوب তাওহীদের ফযীলত এবং তাওহীদ যে সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেয়। এখানে তাওহীদ দ্বারা 'তাওহীদুল ইবাদাহ্' উদ্দেশ্য। দুআ, কুরবানী এবং মানতসহ সকল প্রকার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করার নামই হচ্ছে 'তাওহীদুল ইবাদাহ্'। সূরা গাফেরের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ডাক দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"। সূরা আরাফের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃوَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "তাঁকে ডাক, দ্বীনকে তাঁর জন্য খালেস করে"।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত"। (সূরা আনআমঃ ৮২)

.....

ব্যাখ্যাঃ এখানে যুলুম দ্বারা বড় শির্ক উদ্দেশ্য। মারফু সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য সাহাবীদের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবীগণ বলতে লাগলেনঃ আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের নফসের উপর জুলুম করেনি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ তোমরা এ আয়াতে যুলুম দ্বারা যা বুঝেছ, তা সঠিক নয়। এখানে যুলুম দ্বারা শির্ক উদ্দেশ্য। তোমরা কি আল্লাহর প্রিয় বান্দা লুকমান (আঃ)এর কথা শুন নি? তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেনঃ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র সাথে শরীক করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাথে শরীক করা মহা যুলুম"। (সূরা লুকমানঃ ১৩) সুতরাং এই অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি শির্ক থেকে মুক্ত থাকবেনা, তার জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়াত অর্জন করা কোন ক্রমেই সম্ভব হবেনা। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি শির্ক থেকে বেঁচে থাকবে, ঈমান ও ইসলামের উপর টিকে থাকা অনুপাতে তার জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়াত অর্জিত

হবে। যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, সে জীবিত অবস্থায় সর্বদা কবীরা গুনাহ্ করেনি, পূর্ণ নিরাপত্তা ও হেদায়াত কেবল তার জন্যই অর্জিত হবে। আর যেই তাওহীদপন্থী গুনাহ করে তাওবা না করেই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে তাওহীদ অনুপাতে নিরাপত্তা ও হেদায়াত প্রাপ্ত হবে এবং গুনাহর অনুপাতে নিরাপত্তা ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

“অতঃপর আমার নির্বাচিত বান্দাদেরকেই কিতাবের অধিকারী করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে রয়েছে। এটাই মহা অনুগ্রহ”।[1] (সূরা ফাতিরঃ ৩২) সুতরাং যালেম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে সৎ ও অসৎ আমলের মিশ্রণ ঘটানোর মাধ্যমে নিজের উপর যুলুম করেছে। তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে তাঁকে ক্ষমা করবেন। আর ইচ্ছা করলে গুনাহ্র কারণে তাঁকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু তাওহীদের কারণে তাকে চিরকাল জাহান্নামে রাখবেন না; বরং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। মধ্যমপন্থী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে শুধু ওয়াজিবগুলো পালন করে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে। এটিই আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের অবস্থা। কল্যাণের পথে ও সৎকর্মে অগ্রগামী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে ইলম ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যে সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।[2] শেষ দুই শ্রেণীর মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা ও পূর্ণ হেদায়াত অর্জিত হবে। সুতরাং জানা গেল পূর্ণ ঈমানদারের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। আর ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদারের জন্য রয়েছে আংশিক বা অসম্পূর্ণ নিরাপত্তা। কেননা পূর্ণ ঈমান মুমিন বান্দাকে দুনিয়াতে পাপ কাজ ও আখেরাতে শাস্তি হতে রক্ষা করবে। সে আল্লাহর সাথে এমন পাপ নিয়ে মিলিত হবেনা, যার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

“তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞাত”। (সূরা নিসাঃ ১৪৭) উপরোক্ত আয়াতের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আমি যা উল্লেখ করলাম, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় তাই বলেছেন। কুরআন এ কথারই প্রমাণ বহন করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্যও তাই। খারেজী, মুতাযেলা এবং অন্যান্য বিদআতী দলের কথা এর বিপরীত।[3]

সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

“যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দান করল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তিনি তাঁর এমন এক কালিমা যা তিনি মরিয়াম (আঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন। তার আমল যাই হোক

না কেন’’।[4]

....

ব্যাখ্যাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, সাক্ষ্য তখনই গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত হয়, যখন তার ভিত্তি হবে ইল্ম, ইয়াকীন এবং সত্যের উপর। অজ্ঞতা এবং সন্দেহের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অজ্ঞতা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত সাক্ষ্য দেয়াতে কোন উপকারও নেই। অজ্ঞতা ও সন্দেহের উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিলে সাক্ষ্যদাতা মিথ্যুক হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে, সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই পবিত্র বাক্যটি অর্থাৎ কালেমায়ে তায়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাহ্-এর সাক্ষ্যটি না বাচক এবং হাঁ বাচক বক্তব্যকে শামিল করেছে। لا إله-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সকল বস্ত হতে ইলাহীয়াতকে নাকোচ করা হয়েছে এবং إلا الله-এর মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইলাহীয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

‘‘আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়’’। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৮) অনেক লোকই কালেমা তায়্যেবার সঠিক অর্থ না জানার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক। তারা মূল অর্থকে পালটিয়ে দিয়েছে। তারা সৃষ্টির মধ্য হতে কবরবাসী, মাজারের খাদেম, তাগুত, বৃক্ষরাজি, পাথর, জিন এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর জন্য উলুহীয়াত সাব্যস্ত করেছে। অথচ কালেমায়ে তায়্যেবার মধ্যে এগুলো থেকে উলুহীয়াতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। তারা এগুলোর উপাসনা করাকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এগুলোকে চাকচিক্যময় ও সুসজ্জিত করে প্রকাশের মাধ্যমে তাওহীদকে বিদআতে রূপান্তরিত করেছে। তারা ঐ সমস্ত তাওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে, যারা নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে মানুষকে আহবান করে। এই সমস্ত কবর পূজারীদের অবস্থা এই পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে যে, জাহেলী যামানার কুরাইশদের অজ্ঞ কাফেররা কালেমায়ে তায়্যেবার যতটুকু অর্থ বুঝত, এই সমস্ত নামধারী মুসলিমরা এই পবিত্র বাক্যটির অর্থ ততটুকুও বুঝতে সক্ষম নয়। জাহেলী যামানার কাফেররা কালেমায়ে তাওহীদের অর্থ খুব ভাল করেই বুঝত। কিন্তু কালেমায়ে তায়্যেবা যেই ইখলাস তথা এককভাবে আল্লাহর এবাদত করার প্রতি আহবান করে, তারা কেবল তাকেই অস্বীকার করেছিল। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

‘‘তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তখন তারা অহঙ্কার করত এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (সূরা আস্ সাফফাতঃ ৩৫-৩৬)

এই উম্মতের বর্তমান মুসলিম নামধারী মুশরিকরা পূর্বকালের মুশরিকদের মতই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত বর্জন করার দাওয়াতকে অস্বীকার করছে। বর্তমানে এই উম্মতের মুসলিম নামধারী মুশরিকরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে মাজার, গম্বুজ, তাগুত এবং অন্যান্য বস্তুর পূজা শুরু করে দিয়েছে। মক্কার মুশরিকরা কালেমায়ে তায়্যেবা এবং এককভাবে আল্লাহর এবাদত করার তাৎপর্য বুঝে-শুনেই মানতে অস্বীকার করেছিল। আর এই যামানার মুসলিমগণ কালেমার অর্থ না বুঝার কারণে তার দাবী বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করছে। এ জন্যই আপনি দেখবেন যে, সে

الله لا إله إلا বলছে। আর সেই সাথে সে আল্লাহর সাথে অন্যেরও এবাদত করছে!

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেনঃ মাবুদ তিনিই হতে পারেন, লোকেরা অন্তরের একনিষ্ঠতার সাথে যার এবাদত করে, তাকে ভালবেসে, ভয়ের সাথে তাঁরই বড়ত্ব প্রকাশ করে, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে, তাঁকেই সম্মান করে, তাঁর সামনেই নতি স্বীকার করে, তাঁর সামনেই বিনয়ী হয়, তাঁকেই ভয় করে, তাঁর কাছেই আশা করে এবং তাঁর উপরই ভরসা করে।

উযীর আবুল মুযাফ্ফার (রঃ) তার 'ইফসাহ' নামক গ্রন্থে বলেনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য দেয়ার দাবী হচ্ছে, সাক্ষযদাতা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করো, তোমার নিজের গুনাহর জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য"। (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯) এখানে لا إ _এর পরে الله মারফু হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহই হচ্ছেন এবাদতের একমাত্র হকদার। আল্লাহর যাতে পাক ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের হকদার নন। কালেমায়ে তায়্যেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, এই পবিত্র বাক্যটি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে প্রত্যেক তাগুতকে অস্বীকার করার দাবী জানায়। সুতরাং আপনি যখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তু হতে উলুহীয়াতকে অস্বীকার করবেন এবং শুধু আল্লাহর জন্যই তা সাব্যস্ত করবেন, তখন আপনি সমস্ত তাগুতকে অস্বীকারকারী এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।

ইমাম ইবনে রজব[5] (রঃ) বলেনঃ ইলাহ্ হচ্ছেন সেই সত্তা, যার আনুগত্য করা হয় এবং যার নাফরমানী করা হয়না। যাকে সম্মান করা হয়, যার বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়, যাকে ভালোবাসা হয়, যাকে ভয় করা হয়, যার কাছে আশা করা হয়, যার উপর ভরসা করা হয়, যার কাছে চাওয়া হয় এবং যার কাছে দুআ করা হয়। এসব বস্তু মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা শোভনীয় নয়। যে ব্যক্তি উলুহীয়াতের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যে কোন মাখলুককে আল্লাহর সাথে শরীক করল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার ক্ষেত্রে তার ইখলাস ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং তার মধ্যে সেই ত্রুটি অনুযায়ী মাখলুকের উবুদীয়াত পাওয়া যাবে।

ইমাম বিকাঈ (রঃ) বলেনঃ الله لا إ إله _এই পবিত্র বাক্যটি মহান বাদশাহ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ থাকার কথাকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেছে। এই বিশ্বাসই কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে নাজাতের সর্বোত্তম মাধ্যম। কালেমার এই জ্ঞানটি তখনই প্রকৃত জ্ঞান বলে বিবেচিত হবে, যখন তা উপকারী হবে। আর তা উপকারী তখনই হবে, যখন তা অন্তর থেকে পাঠ করা হবে এবং তার দাবী অনুযায়ী আমল করা হবে। অন্যথায় তা নিছক মূর্খতা বলেই গণ্য হবে।

ভাষ্যকার বলেনঃ আমি বলছি যে, এই উম্মতের পরবর্তী যামানার লোকেরা الله لا إ إله _এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। এর সঠিক অর্থকে রুবুবীয়াতের অর্থের মাধ্যমে বদল করে ফেলেছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর জন্য শুধু সৃষ্টি করা ও প্রতিপালন করার ক্ষমতা সাব্যস্ত করছে। এর মাধ্যমে তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ যেই শির্ক থেকে নিষেধ করেছে, তারা আল্লাহর জন্য তাই সাব্যস্ত করেছে। তারা মূর্খতা বশতঃ কালেমা তায়্যেবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'& আল্লাহর জন্য যেই এবাদতকে খালেস করতে বলেছে, তা করতে অস্বীকার করেছে। সূরা যুমারের ২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃفَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ "তুমি আল্লাহর এবাদত কর, দ্বীনকে তাঁর জন্য খালেস করে"।

ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ দীর্ঘ দিন যাবৎ আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দরজা বন্ধ রয়েছে। বর্তমান সময়ে খুব সীমিত আকারে কেবল এর নামটি বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এটি ইসলামের বিরাট একটি স্তম্ভ। এর মাধ্যমেই কল্যাণের পথ প্রসারিত এবং স্থায়ী হয়। আর এর অবর্তমানে অন্যায় ও অকল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়। পৃথিবীতে যখন পাপকাজ ছড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহর শাস্তি ভাল ও খারাপ সকল শ্রেণীর লোককেই পাকড়াও করে। কেউ এ থেকে রেহাই পায়না। ইমাম নববী (রঃ) বর্তমান সময় বলতে হিজরী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতক উদ্দেশ্য করেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী সালের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে দশম ও তার পরবর্তী শতকের অবস্থা কেমন ভয়াবহ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ইসলামের দুর্বলতা প্রকট আকার ধারণ করেছে তথা সঠিক ইসলাম একেবারেই অপরিচিত হয়ে গেছে। আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রঃ) গুরবাতুল ইসলামের এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মত সুন্দর ও অভিনব ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অন্য কেউ প্রদান করেনি। শাইখের ব্যাখ্যাটি পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা এই ব্যাখ্যাটি জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।[6]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ وحده لا شريك له ‘‘তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই’’-এই বাক্যটি لاإله إلا الله এর অর্থকে শক্তিশালী করছে এবং এর প্রকৃত তাৎপর্যকেই ব্যাখ্যা করছে। মূলতঃ এটিও তাওহীদের প্রমাণ বহন করে। সুতরাং لاإله কথাটি এবাদতের মধ্যে সামান্যতম শির্ক করাকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। لاشريك له কথাটি সেই অর্থকেই সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করেছে। অর্থাৎ এবাদতে আল্লাহর কোন শরীক নেই। وحده এর মধ্যে إلا الله এর অর্থ বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত আসমান-যমীনের কেউ কোন প্রকার এবাদতের হকদার নয়। কুরআনের মুহকাম আয়াতগুলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুতাওয়াতের হাদীছগুলো এ কথারই প্রমাণ বহন করে। আপনি যখন এই ব্যাখ্যাকে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, তখন আপনার কাছে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বাতিল বলে প্রমাণিত হবে, যারা বলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দুআ করা জায়েয। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে বলেনঃ

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

‘‘অতএব, তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেনা। করলে শাস্তিতে পতিত হবে’’। (সূরা শুআরাঃ ২১৩) এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে। অচিরেই এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশা-আল্লাহ্ । সুতরাং وحده لا شريك له এর মধ্যে وحده শব্দটি হাঁ বাচক বিষয়কে জোরদার করছে আর لا شريك له বাক্যটি না বাচক বিষয়কে জোরদার করছে।

হাদীছের অংশ وأن محمدا عبده ورسوله ـ এর অর্থ হচ্ছে অন্তর থেকে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এ কথার দাবী হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা হবে, তাঁর আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান করা হবে এবং তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করা হবে। কোন মানুষের কথা দ্বারা তাঁর সুন্নাতের বিরোধীতা করা যাবেনা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো কথা ভুলের উর্ধ্বে নয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ভুল থেকে হেফাজত করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। নিম্নের আয়াতে তাঁর আনুগত্য বর্জনকারীদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

“অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে পর্যন্ত তারা ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা পাবেনা এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে”। (সূরা নিসাঃ ৬৫) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“অতএব, যারা তাঁর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে।” (সূরা নূরঃ ৬৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) বলেনঃ আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য আশ্চর্যবোধ করি, যারা হাদীছের সনদ ও তার সত্যতা জানার পরও সুফীয়ানের রায় গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“অতএব, যারা তাঁর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে”। তুমি কি জান ফিতনা[7] কাকে বলে? ফিতনাহ্ হচ্ছে শির্ক। কোন মানুষ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কথা প্রত্যাখ্যান করবে, তখন এমন আশঙ্কা রয়েছে যে, তার অন্তরে বক্রতা প্রবেশ করবে। পরিণামে সে ধ্বংস হবে। বর্তমানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ত্রুটি করা হচ্ছে। তা বর্জনও করা হচ্ছে। তাঁর সুন্নাত ও কথার উপর ঐ সমস্ত লোকদের কথাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, যাদের কথার মধ্যে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে আলেমরা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়টি বর্তমানে সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূলঃ এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে ঐ মহা সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে, যা বিশ্বাস করা ফরয। কুরআনের মুহকাম আয়াতসমূহ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। তাতে কাফের খৃষ্টানদের প্রতিবাদও রয়েছে। এরা তিনটি দলে বিভক্ত। এক দলের কথা হচ্ছে, ঈসা (আঃ)-ই আল্লাহ্। অন্য দল বলছে, তিনি আল্লাহর পুত্র। আরেক দলের মত হচ্ছে, আল্লাহ্ তিনজনের একজন। অর্থাৎ ঈসা, তাঁর মা মারইয়াম এবং তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে এ বিষয়ে মূল সত্যটি বর্ণনা করেছেন এবং বাতিলের প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

“হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা এবং আল্লাহ্র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলোনা। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহ্র রাসূল এবং তার বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং তারই কাছ থেকে আগত একটি রূহ। অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে এবং তার রাসূলগণকে মান্য করো। আর এ কথা বলোনা যে, আল্লাহ্ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো; তোমাদের মঙ্গল হবে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়া তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র এবাদত করতে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন"। (সূরা নিসাঃ ১৭১-১৭২) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। তুমি জিজ্ঞাসা করো, তবে আল্লাহ্ যদি মসীহ্ ইবনে মারইয়াম, তার মা এবং ভূমন্ডলে যারা আছে অচিরেই তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে এমন কারো সাধ্য আছে কি যে আল্লাহ্র কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ্রই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান"। (সূরা মায়িদাঃ ১৭)[৪] সূরা মায়িদার একাধিক স্থানে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা এসেছে। এ সমস্ত স্থানে আল্লাহ্ তাআলা ঐ কথা বলে দিয়েছেন, যা ঈসা (আঃ) জন্মের পর মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় ব্যক্ত করেছিলেন। সূরা মারইয়ামের ২৭ থেকে ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

"অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিনী ছিলেন না। অতঃপর তিনি হাত দ্বারা সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো? সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। আর আমি জননীর অনুগত হবো। আমাকে তিনি অহংকারী ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে। ইনি হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়, তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন এ কথাই বলেনঃ হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়। আর ঈসা বলেছিলঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তোমরা তাঁর এবাদত করো। এটাই সরল পথ"। এখানে আল্লাহ্ তাআলা ঐ সঠিক পথের আলোচনা করেছেন, যে পথের অনুসারীরা নাজাতের হকদার হবে। আর যে ব্যক্তি ঐ পথের বাইরে চলবে, সে ধ্বংস হবে। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল-

ইমরানের ৫৯-৬০ নং আয়াতে বলেনঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মত। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন তারপর তাকে বলেছিলেনঃ হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। যা তোমার প্রতিপালক বলেন তাই যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়োনা”। আল্লাহ্‌ তাআলা সীরাতুল মুস্তাকীমকে সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর তাওহীদের দলীল-প্রমাণসমূহ বর্ণনা করেছেন। মুশরিকদের অপছন্দ সত্ত্বেও তিনি সত্যকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মিথ্যাকে বাতিল করেছেন।

ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর এমন এক কালিমা, যা তিনি মরিয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছেনঃ এখানে কালিমার অর্থ হচ্ছে তাঁর বাণী كُنْ হয়ে যাও। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআলা ঈসা (আঃ)কে তাঁর কালিমা كُنْ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারা আরো প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কথা বলেন, কথা বলা তাঁর অন্যতম একটি সিফাত। কিন্তু জাহমীয়ারা এতে বিশ্বাস করেনা।

ঈসা (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রূহঃ এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তিনি ঐ সমস্ত রূহের অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আঃ)এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নির্গত করেছেন এবং তাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই হচ্ছেন তাদের প্রভু ও মাবুদ। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“আর যখন তোমার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিলনা”। (সূরা আরাফঃ ১৭২) সুতরাং ঈসা (আঃ)এর রূহ ঐ সমস্ত রূহের অন্তর্ভূক্ত, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ইবনে জারীর[9] (রঃ) সূরা মারইয়ামের ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ওয়াহাব বিন মুনাবিবহ[10] (রঃ)এর বরাত দিয়ে বলেনঃ জিবরীল মারিয়ামের কোর্তার পকেটে ফুঁ দিলেন। ফুঁ-এর প্রভাব মারইয়ামের জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এতে তিনি গর্ভবতী হয়ে গেলেন। ইমাম সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ ফুৎকারের প্রভাব মারইয়ামের বক্ষদেশে প্রবেশ করল। এতেই তিনি ঈসা (আঃ)কে পেটে ধারণ করলেন। ইবনে জুরাইয (রঃ) বলেনঃ বলা হয় যে, জিবরীল (আঃ) মারইয়ামের কোর্তার গলদ্বারে ও আস্তীনে ফুঁ দিয়েছেন।

সার কথা হচ্ছে, জিবরীল ফুঁ দিয়েছেন আর আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর كُنْ বাক্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঈসা (আঃ) সৃষ্টি হয়ে গেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা সূরা হিজ্রে আদম (আঃ)-এর ব্যাপারে বলেনঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ

“আর তোমার প্রভু যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁ দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পরে যেয়ো। তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল। কিন্তু

ইবলীস ব্যতীত। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানালো। (সূরা হিজরঃ ২৮-৩১) সেই সত্তা অতি পবিত্র, যিনি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি কর্তা নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের যোগ্যও নয়।

কতিপয় খৃষ্টান মুসলমানদের কতক আলেমের সাথে আল্লাহর বাণীঃ وَرُوحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ ঈসা (আঃ) আল্লাহর রূহ, -এ কথার মাধ্যমে দলীল পেশ করে তর্ক শুরু করল। তারা বলতে চাইল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর রূহ তথা আল্লাহর অংশ বা তিনিই আল্লাহ্। তখন মুসলিম আলেমগণ তাদের উত্তরে বললেনঃ এটি শুধু ঈসা (আঃ)এর জন্য খাস নয়; বরং ঈসা (আঃ) এর মতই সকল সৃষ্টি আল্লাহর এবং আল্লাহর পক্ষ হতে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা সূরা জাসিয়ার ১৩ নং আয়াতে বলেনঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“এবং তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত জিনিষকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। সবকিছুই তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে”। (সূরা জাসিয়াঃ ১৩) অর্থাৎ আসমান-যমীনের সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা একমাত্র তিনি। তার মধ্যে ঈসা (আঃ)ও শামিল। অন্যান্য সকল বস্তুর ন্যায় তিনি ঈসাকেও সৃষ্টি করেছেন”।

ফুটনোট

[1] - এই আয়াতে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) যালেমঃ যালেম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে সৎ আমল করার সাথে সাথে খারাপ আমলও করে। কখনো ভাল আমল করে আবার কখনো হারাম কাজে লিপ্ত হয়। এর মাধ্যমে সে নফসের উপর যুলুম করছে। এই শ্রেণীর মানুষের জন্য দুনিয়াতে ও আখেরাতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। তারা পরিপূর্ণ নিরাপদ ও পরিপূর্ণ হেদায়াতপ্রাপ্ত নয়। দুনিয়াতে তারা পূর্ণ ঈমান ও হেদায়াতের উপর নেই। আর আখেরাতেও তারা আল্লাহর শাস্তি ও পাকড়াও হতে পূর্ণ নিরাপদ নয়। মৃত্যুর পর তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দিবেন। তবে শাস্তি দিলেও তিনি তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে রাখবেন না। তাওহীদের কারণে তিনি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে আশ্রয় দিবেন।

(২) মুকতাসিদঃ মুক্তাসিদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর সকল হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে। সেই সাথে সকল প্রকার ফরয ও ওয়াজিব আমল সম্পাদন করে। কিন্তু নফল এবাদতের প্রতি তাদের রয়েছে প্রচুর অনাগ্রহ। (৩) সাবিকুন বিল খায়রাতঃ এরা হচ্ছে ঐ শ্রেণীর লোক, যারা সকল প্রকার হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে এবং সকল প্রকার ওয়াজিব ও ফরয আমলগুলো সম্পাদন করে। সেই সাথে তারা নফল ও সুন্নাতী আমলের দিকে প্রতিযোগীতামূলকভাবে অগ্রসর হয়। শেষ দুই শ্রেণীর মানুষের জন্যই রয়েছে দুনিয়াতে হেদায়াত এবং আখেরাতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

[2] - তারীকুল হিজরাতাইন, পৃষ্ঠা নং- ৩১৪-৩৩৫।

[3] – مقالات الخوارج والمعتزلة – الفَرْق بين الفِرَق ص (73، 117)

4]]- বুখারী, অধ্যায়ঃ আল্লাহর বানী, হে আহলে কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।

[5] - তিনি হচ্ছেন হাফেয আব্দুর রাহমান বিন আহমাদ বিন রজব আলবাগদাদী আদ্ দিমাশকী আলহাম্বালী। দ্বীনের খেদমতে তার অনেক লেখনী রয়েছে। তার মধ্যে লাতাইফুল মাআরিফ, যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা এবং জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম অন্যতম। তিনি ৭৯৫ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।

[6]- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

“ইসলাম অপ্রসিদ্ধ অবস্থায় এসেছে। অচিরেই তা গরীব অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং গরীবদের জন্য সুখবর”। ইমাম মুসলিম এই হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। শাইখ সিন্দী রাহিমাহুল্লাহ ইবনে মাজার হাশীয়াতে বলেনঃ গরীব শব্দের অর্থ হল, ইসলামের সূচনার সময় এর অনুসারী ছিল খুবই কম। মূলতঃ জন্মভূমি থেকে দূরে অবস্থানকারী লোককেও গরীব বলা হয়। অচিরেই ইসলাম আগের মতই গরীব হয়ে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে যেমন এর অনুসারী ছিল খুবই কম, আখেরী যামানায়ও অবস্থা সে রকম হবে। সে সময় অল্প সংখ্যক লোকই সঠিক ইসলামকে মেনে চলবে এবং ইসলামের সাহায্য করবে। যদিও সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা প্রচুর হয়। সুতরাং ইসলামের এই অল্প সংখ্যক ধারক ও বাহক লোকদের জন্য রয়েছে সুখবর (তুবা)। তুবা শব্দটিকে একাধিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ বলেছেনঃ তুবা হচ্ছে একটি বেহেশতের নাম। আবার কেউ বলেছেনঃ এটি হচ্ছে বেহেশতের একটি বিরাট গাছ।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সত্যিকার ইসলামের সাহায্য করতে চাইলে এবং দৃঢ়ভাবে ইসলামকে ধারণ করতে চাইলে স্বদেশ ত্যাগ করা এবং এ জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থা এ রকমই ছিল। ইমাম নববী (রঃ) হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাযী ইয়াযের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ ইসলাম অল্প কয়েকজন মানুষের দ্বারা শুরু হয়েছে। তারপর এর প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। অতঃপর এতে ত্রুটি চলে আসবে এবং শেষ যামানায় অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যেই এর অনুসরণ ও অনুশীলন সীমিত হয়ে যাবে। যেমনটি ছিল প্রথম অবস্থায়।

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফতোয়া ও গবেষণা বিভাগের স্থায়ী কমিটির ফতোয়ায় এসেছে, হাদীছের অর্থ হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন মাত্র অল্প কিছু লোক এই দাওয়াত গ্রহণ করল। সুতরাং তখন এর অনুসারী অল্প হওয়ার কারণে এবং ইসলামের অনুসারীগণ দুর্বল হওয়ার কারণে এটি অপরিচিত ছিল। অপর পক্ষে ইসলামের বিরোধীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তাদের শক্তি ছিল প্রবল এবং মুসলিমদের উপর তাদের যুলুম ও সীমালংঘন ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ফলে মুসলিমদের অনেকেই দ্বীন ও জীবনকে ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে কঠোর নির্যাতন ভোগ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মদীনায় হিজরত করলেন। এই আশায় যে, হয়ত আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দাওয়াতের এমন সমর্থক তৈরী করবেন, যারা তাঁর সাথে যোগ দিয়ে

ইসলামের সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আশা বাস্তবায়ন করলেন, তাঁর সৈনিকদেরকে সাহায্য করলেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন, ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ্ তাআলা কুফরের পতন ঘটালেন এবং তাওহীদের কালেমাকে বুলন্দ করলেন। আল্লাহ্ তাআলা মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। বস্তুতঃ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্যই প্রকৃত সম্মান। দীর্ঘ দিন মুসলিমগণ পৃথিবীতে শক্তিশালী ও সম্মানিত ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়, তাদের মধ্যে দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করে। ধীরে ধীরে তারা পশ্চাৎমুখী হতে থাকে। এক পর্যায়ে ইসলাম পূর্বের ন্যায় অসহায় অবস্থায় ফিরে যায়। এবারের এই দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব কিন্তু মুসলিমদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে নয়। দ্বীনকে আঁকড়িয়ে না ধরার কারণে, আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে ধারণ না করার কারণে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়াতকে বর্জন করার কারণে বর্তমানে মুসলিমগণ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং মুসলিমদের মাঝেই সঠিক ইসলামের গুরবত প্রকট আকার ধারণ করেছে। অল্প সংখ্যক মুসলিম ব্যতীত বেশীর ভাগ লোকই দুনিয়ার সম্পদ ও সামগ্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ও ব্যস্ত রয়েছে। পূর্ববর্তী জাতির ন্যায়ই তারা দুনিয়া অর্জনে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত রয়েছে এবং দুনিয়ার সম্পদ ও নেতৃত্ব দখলের মোহে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রয়েছে। এতে ইসলামের শত্রুরা সুযোগ পেয়েছে। তারা মুসলিম দেশগুলোতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদেরকে অপমানিত-অপদস্ত করেছে ও তাদের উপর কঠিন জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। এটিই হচ্ছে ইসলামের গুরবত, যে অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছিল।

শাইখ মুহাম্মাদ রশীদ রেযাসহ এক দল আলেম মনে করেন, অত্র হাদীছে দ্বিতীয়বার ইসলামের দুর্বলতার পর ইসলামের বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ وسيعود غريباً كما بدأ অচিরেই সূচনার ন্যায় অবহেলিত অবস্থায় ফেরত যাবে। সুতরাং প্রথমবারের দুর্বলতার পর যেমন ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং ইসলামের প্রসার ঘটেছে, তেমনি দ্বিতীয়বার দুর্বলতার পর পুনরায় ইসলামের বিজয় ও প্রসার ঘটবে। এই মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। আখেরী যামানায় ইমাম মাহদী এবং ঈসা (আঃ)এর অবতরণের হাদীছসমূহে এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। সে সময় ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে এবং মুসলিমগণ শক্তিশালী ও বিজয়ী থাকবে। কুফর ও কাফের সম্প্রদায় পরাস্ত ও পদদলিত হবে।

[7] - ফিতনা শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে বিরত রাখা, ফিরে যাওয়া, পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি। এই অর্থেই আল্লাহর এই বাণীতে ফিতনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

“কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্যরা কাউকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, সে ব্যক্তিকে ছাড়া যে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারী হবে”। (সূরা সাফফাতঃ ১৬১-১৬২) এখানে বলা হয়েছে, হে মুশরেকের দল! তোমরা এবংতোমাদের ঐসব মাবুদ, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আহবান করে থাকো, তারা কোন মুমিনকেই ঈমান থেকে ফিরিয়ে কুফরীর দিকে নিতে পারবেনা। তবে যাকে আল্লাহ হতভাগ্য বলে জানেন এবং যে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে, তার কথা ভিন্ন।

সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন ছিল, সে যদি কাফের হয়ে যায়, তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় فلان فتن অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি

ফিতনায় পড়েছে। অর্থাৎ সে ঈমানদার মুসলিম ছিল অতঃপর সে ফিতনায় পড়েছে এবং কল্যাণের পথ ছেড়ে অকল্যাণের পথ ধরেছে ও ঈমানের পথ ছেড়ে কুফুরীর পথে চলেছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ফিতনা হত্যার চেয়েও অধিক ভয়াবহ। অর্থাৎ মানুষকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে কুফুরীর দিকে নিয়ে যাওয়া তাদেরকে হত্যা করার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর।

সুতরাং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ)এর কথার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি রাসূলের হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষের কথার দিকে যায়, তার ব্যাপারে আশঙ্কা আছে যে, তাকে মানুষের কথা একটু একটু ফিতনার (কুফুরীর) দিকে নিয়ে যেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ প্রত্যাখ্যানের শাস্তি স্বরূপই তাকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ “অতঃপর তারা চুপে চুপে সরে পড়ল। আল্লাহও তাদের মন বিমুখ করে দিয়েছেন কারণ তারা এমন একদল লোক যাদের বোধশক্তি নেই”। (সূরা বাকারাঃ ১২৭) যেমন আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃفَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ “অতঃপর যখন তারা বাঁকা পথ ধরলো তখনই আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসেকদের হেদায়াত করেন না”। (সূরা সাফঃ ৫)

[৪] - আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“নিঃসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তিনের মধ্যে এক। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। যদি তারা নিজেদের এসব কথা থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি দেয়া হবে”। (সূরা মায়িদাঃ ৭৩) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।এগুলো একেবারেই আজগুবী ও উদ্ভট কথাবার্তা। তাদের পূর্বে যারা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দেখাদেখি তারা এগুলো নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে থাকে। আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তাদের উপর, তারা কোথা থেকে ধোকা খাচ্ছে! তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে এবং এভাবে মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর এবাদত করার হুকুম দেয়া হয়নি। তিনি ছাড়া এবাদতের যোগ্যতা সম্পন্ন আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তারা যেসব মুশরিকী কথা বলে তা থেকে তিনি পাক পবিত্র”। (সূরা তাওবাঃ ৩০-৩১)

সুতরাং যেসব খৃষ্টান বলে মসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ, যারা বলে আল্লাহ তিন মাবুদের এক মাবুদ এবং যারা বলেঃ ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর পুত্র- এই তিন দলের সকলেই কাফের।

[9] - তিনি হচ্ছেন, বিখ্যাত মুফাস্সির এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারী। তিনি ৩১০ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। বিস্তারিত দেখুনঃ তাবাকাতুস শাফেঈয়া (৩/১২০), ওফীয়াতুল আয়ান (১/৩৩২), শাযরাতুয্ যাহাব (২/২৬০)।

[10] - তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল্লামা ইমাম ওয়াহাব বিন মুনাবিবহ বিন কামিল আল ইয়ামানী। তিনি কিচ্ছা ও ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধতা অর্জন করেন। মুহাদ্দিছগণ তাঁর সমালোচনা করেছেন। অর্থাৎ হাদীছ বর্ণনায় তিনি মুহাদ্দিছদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তিনি ১১৪ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। বিস্তারিত দেখুনঃ সিয়ারু আলামিন্ নুবলা (৪/৫৪৪) , আল ইবার (১/১০৯-১১৩), শাযারাতুয্ যাহাব (১/১৫০)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12042

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন